***Pratidhwani the Echo***
*A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science*
***ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)***
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
*Volume-VI, Issue-I, July 2017, Page No. 16-28*
*Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India*
*Website: http://www.thecho.in*

# মহাশ্বেতা দেবীর ছোটোগল্পে অন্ত্যজ ও আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতির পরিসর : নির্বাচিত গল্পকেন্দ্রিক বিশ্লেষণ

**রাজেশ খান**
*এম.ফিল ছাত্র, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
**ড. সুজয়কুমার মণ্ডল**
*অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

***Abstract***

*Mahashweta Devi was one of the greatest novelist and fiction writers of Bengali language of the twentieth century. She was also known to be an active social worker. That is why; she had the opportunity to observe the people in her locality and other area very closely, most of which are indigenous communities and communities which lies in the 'lower stratum' of society, like the Bagdi, Dom, Pakhamara, Ganju, Mal, Khariya, Bauri etc. Based on her real life experiences, she has created many coveted literature by using the social life of those inferior communities which have represented different ethnicities in different fields. Mahashweta Devi compiled many short stories based life and lore of indigenous people. Several short stories and edited book have been published based on these short stories. For example, there are a number of notable story texts - Shalgir Dak (1982), Iter Por It (1982), Hariram Mahato (1982), Sidhu Kanur Dake (1985) etc. She spent most of her life with the indigenous tribal people and with the communities who were on the 'lower stratum' of society. In most cases, she unveils an alternative history to develop mental consciousness of the inner struggle. In this article, we will try to highlight the 'life' and 'lore' of different tribal societies and cultures of the communities of 'lower stratum' in Mahishweta Devi's short story and it will also be discussed how she played her role to help them. Apart from this, various perspectives will also be available in this discussion, which will describe her journey of becoming a literary person.*

***Key Words: Tribe, Society, Lore, Culture, Subaltern.***

**১. গোড়ার কথা:** মহাশ্বেতা দেবীর ছোটোগল্পে অন্ত্যজ ও আদিবাসীদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। বাস্তব অভিজ্ঞতা নির্ভর সমাজ-জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিস্থাপন করে তিনি একাধিক কালজয়ী সাহিত্য সৃজন করেছেন, যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করেছে সাঁওতালসহ অন্যান্য জনজাতিসমূহ। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় বাগদি, ডোম, পাখমারা, ওঁরাও, গঞ্জু, মাল, খেড়িয়া, লোধা-শবর প্রভৃতি জনজাতির কথা।

মহাশ্বেতা দেবী অন্ত্যজ ও আদিবাসীদের জীবন উপজীব্য করে প্রচুর ছোটোগল্প রচনা করেন। এসব ছোটোগল্প নিয়ে একাধিক গল্পগ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গল্পগ্রন্থ হল: 'শালগিরার ডাকে' (১৯৮২), 'ইটের পরে ইট' (১৯৮২), 'হরিরাম মাহাতো' (১৯৮২), 'সিধু কানুর ডাকে' (১৯৮৫) প্রভৃতি। জীবনের বেশিরভাগ সময় তিনি অতিবাহিত করেছেন অন্ত্যজ আদিবাসীদের সঙ্গে। উদ্দিষ্ট জনজাতির ভৌগোলিক পরিবেশ-পরিস্থিতি-অবস্থান, পার্থিব জীবন-যাপন প্রণালী, সুস্পষ্ট জীবন ধারা অনুধাবন এবং উপলব্ধিজাত জীবনাভিজ্ঞতা স্থান পেয়েছে তাঁর সৃজনী শিল্পে। সেই কারণে তাঁর একাধিক লেখা হয়ে উঠেছে অন্ত্যজ শ্রেণির ঐতিহাসিক দলিল। ইতিহাসের সমান্তরালে তিনি রচনা করেছেন জনবৃত্ত অন্বেষণের বিকল্প ইতিহাস। আর এই ইতিহাসের ভেতরেই সুপ্ত থাকে সমাজনীতি, অর্থনীতি এবং তার আনুষঙ্গিক আচার-আচরণ, সংস্কৃতি, দেশজ জীবন-ব্যবস্থা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তিনি অন্তেবাসীদের সংগ্রামের মানসিক চেতনার বিকাশ ঘটাতেই বিকল্প এক ইতিহাসের উন্মোচন করেছেন। নানাবিধ কারণেই লেখক বিশেষভাবে নারীদের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অন্ত্যজ ও আদিবাসী নারীচরিত্রে বহুমুখী প্রতিবাদী স্বর পরিলক্ষিত হয়। তাঁর সাহিত্যে লালিত নারীসমাজ অনন্যতায় ভাস্বর। বীর্যে, বুদ্ধিতে, সাহসে, প্রতিবাদ-প্রতিরোধে, প্রেমানুভূতি ও প্রেমাকাঙ্ক্ষায় নারীকে স্বমহিম করে দেখার আর্তি বা আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করা যায় মহাশ্বেতা দেবী সৃষ্ট নারী চরিত্র সৃজনে। অবশ্য এসব কিছুর অধিকাংশ সম্ভব হয়েছে তাঁর বহুমুখী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য-ধর্মীতার জন্য। মহাশ্বেতা দেবী একাধারে খ্যাতিমান লেখক এবং সংস্কৃতি ও মানবাধিকার কর্মী, যা তাঁর সাহিত্য সম্ভারের বিষয়-বৈচিত্রতা এবং পরিপূর্ণতা দান করেছে। অরণ্যচারী জন-জীবন সৃজনে, তিনি 'সাব-অলটার্ন' ভাবধারায় প্রভাবিত হয়েছেন। উপজাতিদের বঞ্চনা ও বিভিন্ন সমস্যার কথায় প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর ছোটোগল্পগুলিতে। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রান্তীয় গোষ্ঠীদের পরিবর্তন সাপেক্ষে, ভারতীয় সমাজ-রাজনীতি ভাবনার পরিবর্তিত রূপচিত্র — যা আসলে বিপন্নতার দলিল এবং সাহিত্য রচনার আধারে স্থানীয় ইতিহাস সৃজনের নবোদ্ভূত কৌশল। আখ্যান গ্রন্থনে কেবল সমাজতত্ত্বই উঠে আসেনি, সঙ্গে সঙ্গে পাঠক-কূল সমাজ-মনস্তত্ত্বর সন্ধান পান। আলোচ্য নিবন্ধে মহাশ্বেতা দেবীর ছোটোগল্পে অন্ত্যজ ও আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতির পরিসর নির্ণয়ের চেষ্টা করা হবে।

**২. 'মহাশ্বেতা ঘটক' থেকে 'লেখক মহাশ্বেতা দেবী': সাহিত্যিক সৃষ্টির উর্বরভূমি ও তার প্রেক্ষাপট:** সাংস্কৃতিক ভাবানুভূতির বনেদিয়ানা ভাব পরিলক্ষিত হয় মহাশ্বেতা দেবীর পারিবারিক ঐতিহ্যে। তাঁর বাবা মনীশ ঘটক। তিনি বিশিষ্ট সাহিত্যিক হিসাবে সুপরিচিত নাম। কাকা ঋত্বিক ঘটক। তিনি ভারতের চলচ্চিত্রের এক ব্যতিক্রমী প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব এবং শ্রদ্ধেয়জন হিসাবে পরিচিত। তাঁর স্বামী বিজন ভট্টাচার্য উৎকৃষ্টমানের নাট্যব্যক্তিত্ব এবং পুত্র নবারুণ ভট্টাচার্যও একজন স্বনামধন্য লেখক। মহাশ্বেতা দেবীর পারিবারিক ঐতিহ্যগরিমা প্রসঙ্গে একটি উদ্ধৃতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে:

> *"শুধু পিতা বা কাকাই নন, তাঁর মাতা ধরিত্রী দেবীও ছিলেন একাধারে সাহিত্যপ্রেমী এবং সমাজসেবী। তিনি লেখালেখির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ..... পিতা, মাতা, কাকা ছাড়াও তাঁর মাতামহীও ছিলেন বিদূষী মহিলা। জয়শ্রী পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লেখালেখি করতেন। তাঁর বড়ো মামা ছিলেন খ্যাতনামা অর্থনীতিবীদ। এছাড়া মহাশ্বেতার মাতামহ ও পিতামহের বিদ্যাচর্চা ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও ছিল তাঁদের পারিবারিক হৃদ্যতা। অন্যদিকে রবীন্দ্র স্নেহধন্য কবি অমিয় চক্রবর্তী ছিলেন তাঁর মাতা ধরিত্রী দেবীর আপন মামাতো ভাই।"* [১]

– অর্থাৎ বংশধর ও আত্মীয় পরিজনের উচ্চবৈভব সম্পন্ন সংস্কৃতিবান ধারা কতদূর পর্যন্ত যে বিস্তৃত আমরা তা অনুমান করতে পারি। উত্তর প্রজন্মে মহাশ্বেতা দেবীর জীবনে, প্রাপ্ত উত্তরাধিকারী ধারা তাঁর সাহিত্য জীবনকে পরিপুষ্টি দান করেছে – একথা বললে অত্যুক্তি হয় না।

পারিবারিক সূত্রেই তিনি সংস্কৃতিবান এবং সাহিত্যবেষ্টিত পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠেছেন। বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনের সূত্রতা 'মহাশ্বেতা ঘটক' থেকে 'লেখক মহাশ্বেতা দেবী' হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। সেই সাথে অন্যান্য অনুষঙ্গও রয়েছে। আমরা জানি মহাশ্বেতা দেবী প্রখ্যাত ভারতীয় নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হোন। সময়কাল ১৯৪৭। ১৯৫৯ সালে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যায়। মহাশ্বেতা দেবী পরে আবারও বিয়ে করেন। এই সময়কাল অতিবাহিত করা তাঁর পক্ষে বেশ কষ্টকর ছিল। তবে □বৈবাহিক জীবন সঞ্জাত অভিজ্ঞতা ভাণ্ডার পরবর্তী সময়ে তাঁর সাহিত্য জীবনকে নানাভাবে পরিপুষ্টি দান করেছে।

তাঁর সংগ্রাম চলেছে সাহিত্যচর্চা এবং জীবনচর্চার মাধ্যমে। পঠন-পাঠনের শান্তিনিকেতনী সংযোগস্পর্শও তাঁর জীবনে আলাদা মাত্রা যোগ করেছিল। সময়কালের দিক থেকে মাত্র দু'বছর হলেও তা ছিল মহাশ্বেতার জীবনের মাইলফলক। লেখা-লিখির হাতেখড়ি হয় এই পর্বে। তাছাড়া জনবৃত্তের সান্নিধ্যলাভ তাঁর কর্ম জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন আনে। পরবর্তী সময়ে তিনি লেখাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন — 'লিখে খেতে হয়, তাই ঘড়ির কাঁটা ধরে লিখি'। লিখতে লিখতেই সংসারের কাজ দেখভাল করেছেন আবার তা সম্পূর্ণ করেই লেখায় মনোযোগ দিয়েছেন। কিন্তু কখনও লেখার মূল ভাবনার বিচ্যুতি ঘটেনি।

মহাশ্বেতা দেবীর বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ - দুই বাংলার সাথে সংযোগস্পর্শ ছিল। জন্ম বাংলাদেশে। পরবর্তী সময়ে তাঁর পরিবার-পরিজন পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। বাবার চাকুরীসূত্রে মহাশ্বেতা দেবী জনবৃত্তের সংযোগস্পর্শে আসেন। জানা যায় রংপুর শহরের বিভিন্ন জায়গা সাইকেলে ঘুরে ঘুরে দেখতেন। দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরে অংশগ্রহণ এবং দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের পাশে দাড়ানো তাঁর নিত্তনৈমত্তিক কর্মে পরিণত হয়েছিল। মহিলা চালিত বিভিন্ন আত্মরক্ষা সমিতিতে নেতৃত্বদান এবং বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজে নিজেকে নিযুক্ত রাখতেন। দ্বিতীয় বারের জন্য বিবাহ বিচ্ছেদ তাঁর জীবনে গভীর সমস্যার সৃষ্টি করে। প্রচণ্ড মানসিক অশান্তিতে ভুগতেন। মনের কষ্ট চাপতে অন্ত্যজ ও আদিবাসীদের মধ্যে নিজেকে মেলে ধরেন। তাদের নানা ধরনের সমস্যায় নিজেকে উজাড় করে দিতেন।

**৩. সমাজসেবা ও সাহিত্য সৃজন : সমান্তরালে দ্বিবিধ কর্মপ্রয়াস এবং অন্ত্যজ ও আদিবাসী অনুষঙ্গ:** মহাশ্বেতা দেবীর ছোটোগল্পে অন্ত্যজ শ্রেণির কথা, তাদের জীবন সংগ্রামের কথা পরিস্কার ভাবে পরিদৃশ্যমান। তাঁর অন্ত্যজ চিন্তন জগত ছিল অপেক্ষাকৃত ভিন্ন ধরনের। তিনি অন্ত্যজ ও আদিবাসীদের চোখ দিয়ে জীবনকে দেখেছেন। ব্যাখ্যা করার মাধ্যম ছিল সাহিত্য সৃজন। বিষয়বস্তু ও প্লটের ভিত্তি ছিল বাস্তবের প্রেক্ষাপট। তবে তিনি নিজস্ব উপলব্ধিজাত হৃদয়ানুভূতিকেই বেশি করে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাই তার লেখা কখনো রিপোর্টাজে'র বৈশিষ্ট্য ধারায় সীমায়িত থাকেনি। [২] শবরতীর্থ রচনায় মহাশ্বেতা দেবী উল্লেখ করেছেন:

> *"মানুষ যেভাবে তীর্থে যায়, আমি সেভাবেই ভারতের কিছু জায়গায় আদিবাসী ও অন্যান্য ব্রাত্য মানুষদের কাছে দীর্ঘদিন ধরে যাচ্ছি। ..... মূলস্রোত এই ব্রাত্যজনদের ব্রাত্য রেখে নানাভাবে শোষণ করছে বহু শতাব্দী ধরে। ..... যত পাপ আমার মূলস্রোত করেছে ও করছে, তার জন্য আমি আমার জীবন-চিন্তা-কর্ম সাধ্য মতো উৎসর্গ করি পাপস্খালন করতে। ..... আমি ওদের কাছে শিখতে যাই, শেখাতে যাই না। মানব সমাজ ওদের কিছুই দেয় না, তবু ওরা বেঁচে থাকে, এটাইতো শেখার।"* [৩]

- সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সাহিত্য সৃজনের পাশাপাশি তাঁর সমাজসেবামূলক কাজকর্মের সঙ্গে সংযোগস্পর্শ খুব নিবিড়ভাবে ছিল। সংখ্যাধিক্য আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও অন্যান্য সমাজসেবামূলক সংগঠনের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংযোগ ছিল। কখনো প্রতিষ্ঠাতৃরূপে আবার কখনো পরামর্শদাতৃ হিসাবে। প্রফুল্ল রায়ের একটা উদ্ধৃতি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়:

> *"তার সাহিত্যিক জীবন ও ব্যক্তি জীবন আলাদা কিছু নয়। একটি আর একটির পরিপূরক। যাঁরা তথাকথিত বাঙালী নন, বাঙালী সমাজের মুলস্রোতের বাইরে প্রান্তবাসী বহু মানুষের জীবন সংগ্রামের চিত্র ফুটে উঠেছে তার লেখায়। যে সমস্ত পিছিয়ে পড়া মানুষকে নিয়ে লিখেছেন, ব্যক্তি জীবনেও তিনি তাদের সুখ-দুঃখের শরিক, তাদের মাতৃ স্বরূপা এবং বিরাট আশ্রয়স্থল।"*[৪]

তাঁর সাহিত্যিক জীবন ও ব্যক্তি জীবনের মধ্যে ভেদরেখা টানা মুশকিল। একটি অন্যটির পরিপূরক। তাঁর জীবন তথা কর্মজীবনকে দূরে রেখে তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি নিয়ে আলোচনা অসম্পূর্ণ।

**৪. মহাশ্বেতা দেবীর ছোটোগল্পে বিধৃত অন্ত্যজ আদিবাসী সমাজ এবং তাঁদের উন্নয়নে মহাশ্বেতার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ:**
মহাশ্বেতা দেবীর ছোটোগল্পে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাঁওতালসহ অন্যান্য অন্ত্যজ আদিবাসী জনজাতির মানুষের প্রসঙ্গকথা উঠে এসেছে। তাঁরাই কাহিনি বৃত্তের মানক হিসাবে কাজ করেছে। উদাহরণ হিসাবে আমরা উল্লেখ করতে পারি বাগদি, ডোম, পাখমারা, ওঁরাও, গঞ্জু, মাল, খেড়িয়া, লোধা-শবর প্রভৃতি জনজাতির মানুষদের কথা। তিনি আদিবাসীদের জীবনকে সামনে রেখে প্রচুর ছোটোগল্প রচনা করেছেন। এসব ছোটোগল্প নিয়ে প্রকাশিত গল্পগ্রন্থের সংখ্যাও কম নয়। যেমন— 'শালগিরার ডাকে' (১৯৮২), 'ইটের পরে ইট' (১৯৮২), 'হরিরাম মাহাতো' (১৯৮২), 'সিধু কানুর ডাকে' (১৯৮৫) প্রভৃতি। গল্প ধরে ধরে কয়েকটি অন্ত্যজ সমাজ বা সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। 'বান' গল্পে বাগদি সম্প্রদায়, 'বায়েঁন' গল্পে ডোম, 'সাঁজ সকালের মা' গল্পে পাখমারা সম্প্রদায়, 'শিকার' গল্পে ওঁরাও, 'বিছন' গল্পে গঞ্জু, 'বেহুলা' গল্পে ওঝা বা মাল, 'দ্রোপদী' গল্পে সাঁওতাল জনজাতি প্রভৃতি অন্ত্যজ বা আদিবাসীদের জীবনাচার্য এবং তাঁদের সংগ্রামের উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া খেড়িয়া, লোধা, শবর, মুন্ডা প্রভৃতি জনসমাজের কথা উল্লেখ করা যায়।

মহাশ্বেতা দেবী গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে গ্রাম-বাংলার নিঃস্বজনের বেদনার প্রকৃত ছবিটা উপলব্ধি করেন। এসব বিষয়ে তিনি বিভিন্ন মহলে লেখা-লিখিও করেন। সরকার পক্ষকে জানান। তাঁদের এই সমস্যার কথা জানানোর অন্যতম মাধ্যম ছিল মহাশ্বেতার সাহিত্য কলম। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা ও অন্যান্য পত্রিকায় বিশেষ সংখ্যা হিসাবে 'লোধা সংখ্যা','মুন্ডা সংখ্যা', 'ওঁরাও সংখ্যা' প্রকাশ করে সমাজে বিভিন্ন বার্তা দিয়েছেন। সামাজিক অবস্থান, সমাজ-সংস্কৃতিতে তাঁদের ভূমিকা, জীবনাচারণ প্রক্রিয়া প্রভৃতি দিকগুলি অনুপঙ্খভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তেমনি মুসলিম সমাজ নিয়েও তাঁকে কাজ করতে দেখা গিয়েছে। খেড়িয়া, লোধাদের সঙ্গে থেকে কাজ করার অভিজ্ঞতাও তাঁর রয়েছে। তাঁদের জন্য লড়াই করেছেন। মুন্ডা, খেড়িয়াদের সংগঠিত করাই ছিল তাঁর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ-জন নিজেরায় যাতে সংগঠিত হতে পারে বা স্বাবলম্বী হতে পারে সেদিকে মহাশ্বেতা দেবী বেশি করে নজর দিতেন। তাঁদের আত্ম-উন্নয়নে মহাশ্বেতা দেবী কেবল পথপ্রদর্শকের কাজ করে গেছেন, নির্দেশকের কাজ নয়। সে কারণে জনজাতির মানুষেরা স্বাবলম্বী হতে পেরেছে। এটাই ছিল তাঁর মনবাসনা। তাদের সামাজিক স্বীকৃতি প্রদানে মহাশ্বেতা দেবীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে। মেদিনীপুরে লোধা, শবর, পুরুলিয়াতে খেড়িয়া, শবরদের অস্তিত্ব বর্তমান। লোধাদেরকে সরকারী পক্ষ থেকে দেওয়া বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে জনসাধারণকে সজাগ করেন। প্রফুল্ল রায় মহাশ্বেতা দেবীর এই কর্মক্রিয়া সম্পর্কে বলেছেন:

> *"সমাজের প্রান্তিক জনজীবন নিয়ে সমাজের একেবারে তৃণমূল স্তরে গিয়ে যে সমস্ত জনজাতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে তাঁদের জীবনকে শিল্পরূপ দিয়েছেন তা আমাদের কাছে এক নতুন অভিজ্ঞতা। বাংলা সাহিত্যে এমনকি আগে আমরা দেখিনি।"*[৫]

— কেবল পশ্চিমবঙ্গের মানুষই তাঁর চিন্তন বা ভাবনায় ছিল না। তাঁর কর্ম-পরিধিতে বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিসগড়ের অন্ত্যজ জনজাতির মানুষরাও ছিল। সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে সবসময় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন মহাশ্বেতা দেবী। ২০০৫ সালে সিঙ্গুর জমি নিয়ে তুমুল রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু হয়। তিনি সেই আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। নন্দীগ্রাম আন্দোলনেও তাঁর ব্যাপক ভূমিকা ছিল। সিঙ্গুরের জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে

নিয়মিত লিখে চলেছেন বিভিন্ন দৈনিক পত্র-পত্রিকায়। কেবল সাহিত্য সৃষ্টি নয়, সাহিত্যে তিনি যে নীতি, নৈতিকতা, মূল্যবোধের কথা বলতেন, সেটা তিনি বাস্তব জীবনযাপনেও অনুসরণ করার পক্ষ্যপাতি ছিলেন।

**৫. মহাশ্বেতা দেবীর ছোটোগল্পে অন্ত্যজ ও আদিবাসী নারী চরিত্র : প্রতিবাদে ভাস্বর :** ষাটের দশকের আগে পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য-জগতে ঘোরাফেরা করেছে অন্যান্য পুরুষ চরিত্রের পাশাপাশি মূলত মধ্যবিত্ত মেয়েরা; গল্প, উপন্যাসের কাহিনি ও প্লট নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তারা। প্রাধান্য পেয়েছে মধ্যবিত্ত মেয়েদের মানসিক টানাপড়েন। নারীকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর নিরিখে এমনটা বলা অপ্রাসঙ্গিক নয়। ষাটের দশক পরে সত্তরে দশকে বাংলা সাহিত্যে নারীকেন্দ্রিক আলোচনায় বিশেষ পরিবর্তনের সূচনা হয়। নারীকে ভিন্নভাবে উপস্থাপনের আকাঙ্ক্ষা পরিলক্ষিত হয়। অপেক্ষাকৃত আরোও গভীরভাবে, সামগ্রিকতার দৃষ্টিতে (Holistic View) নারী চরিত্র উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়। এতে করে বিষয় সংশ্লিষ্ট ঘটমান সমাজ-জীবনের বিশেষ বিশেষ বাক বা গতিপরিবর্তনকে চিহ্নিত করা যেমন সম্ভব, তেমনি সামগ্রিকভাবে নারীর জীবন-পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রতিবেশ সম্পর্কে অনুপঙ্খ ধারণা নির্মাণও সম্ভব।

মধ্যবিত্ত মেয়েদের পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যে প্রাধান্য দেখা গেল বিভিন্ন জনজাতি, বিভিন্ন শ্রেণী, বর্ণ, ধর্ম, ও দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থিত নারীদের। আর কেবলমাত্র নারীদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নয়, তাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক-ভৌগোলিক প্রেক্ষিতও দেখানোর শুভ প্রচেষ্টা লক্ষ্যণীয়। তবে এই প্রাথমিক প্রচেষ্টার সূচনা হয়েছিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (বুড়ি, ১৯৬৩; নিচু চোখে একটি মেয়েলী সমস্যা, ১৯৬৩) ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (ডাইনী, ১৯৭৩) প্রমুখ সাহিত্যকদের কিছু রচনার মধ্যদিয়ে। মহাশ্বেতা দেবীর লেখায় তা আলাদা মাত্রা পেলো। নারীকে স্বমহিম করে দেখার আর্তি বা আকাঙ্ক্ষা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায় তাঁর রচনাসম্ভারে। বীর্যে, বুদ্ধিতে, সাহসে, প্রতিবাদ-প্রতিরোধে, প্রেমানুভূতি ও প্রেমাকাঙ্ক্ষায়— নারীর বহুমুখীন রূপ উপস্থাপনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তিনি অন্যদেরকে ছাপিয়ে গিয়েছেন। প্রাসঙ্গিকভাবেই এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। পুরুষ লেখকদের পাশাপাশি যে ক'জন মহিলা লেখক সাহিত্যের আলোচনায় চলে আসেন তাঁরা হলেন - বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২), আশাপূর্ণা দেবী (১৯০৯-১৯৯৫), সুফিয়া কামাল (১৯১১-১৯৯৯), মহাশ্বেতা দেবী (১৯২৬-২০১৬), নবনীতা দেব সেন (১৯৩৮) এবং মল্লিকা সেনগুপ্ত প্রমুখ। যদিও একটা সময় বাংলা সাহিত্যে পুরুষ লেখকের প্রাধান্য ছিল। সময়কাল পঞ্চাশের দশকের আগে অবধি। মহিলা লেখকদের এই ধারায় মহাশ্বেতা দেবী এক অনন্য নজির।

মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যে নারী পরিসর বা নারী চেতনা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে 'Voiceless section of society' বা অন্ত্যজ কণ্ঠস্বরই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। তবে পৃথকভাবে নারীবাদী দৃষ্টিকোণ বা নারীকে সহানুভূতিমূলকভাবে পর্যালোচনা করা বা নারীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব বলে তাঁর রচনায় পৃথকভাবে কিছু পাওয়া যাবে না। কেননা তিনি নারী ও পুরুষকে মানুষ হিসাবেই দেখতেই স্বচ্ছন্দবোধ করেছেন, পৃথক পৃথকভাবে পর্যালোচনা না করে মানুষ বা 'শ্রেণি' হিসাবে দেখার পক্ষপাতি ছিলেন। এঁরা সকলেই বঞ্চিত। সকলেই শোষিত, নির্যাতিত। তাই তাঁকে নারীবাদী লেখক হিসাবে মূল্যায়ন করা সমুচিত নয়। সেই অবকাশও তিনি দেননি।

বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাজাত ঘটনাপ্রবাহকে সামনে রেখে বৈচিত্র্যময়ী গল্প সৃজন করেন। তাঁর তৃষিত-দৃষ্টি এবং বাস্তবোচিত জীবনাভিজ্ঞতা অন্ত্যজ সমাজের গভীরে প্রবেশে সাহায্য করেছিল। ফলে তাঁর গল্পের প্রেক্ষাপট হিসাবে আদিবাসী জনসাধারণ অনবদ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। মহাশ্বেতা দেবীর ছোটোগল্পে গল্প রচনার প্রেক্ষাপট হিসাবে আদিবাসী সমাজ কীভাবে এসেছে সে সম্পর্কে মধুরিমা চক্রবর্তীকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মহাশ্বেতা দেবী জানান:

> *"আমি বলতে চাই না শুরুতে আদিবাসী সমাজ নিয়ে আমি লিখতে চেয়েছি। আমি দীর্ঘদিন ধরে গল্প লিখছিলাম, যেগুলোতে তাদের নিয়ে কিছু ছিল না। একসময় অগোচরে থাকা*

> *আদিবাসীদের সম্পর্কে জানতে শুরু করি, তখন আমি তাদের নিয়ে গল্প লিখতে বাধ্য হলাম। সেখানে ছিল চুনি কোটাল, লোধা সম্প্রদায়ের নারী যিনি। এই নারী ছিল তার গোত্রের মধ্যে প্রথম গ্র্যাজুয়েট। শিক্ষা অর্জনের পথে তার একটা ভয়াবহ গল্প ছিল। যখন সে বিশ্ববিদ্যালয়ে গেল ক্লাসে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তার শিক্ষক হাজিরা খাতায় তাকে অনুপস্থিত হিসেবে গণ্য করত। তাকে বলা হতো যে তোমরা অপরাধপ্রবণ গোত্রের (ব্রিটিশ আমলে এই আদিবাসী গোষ্ঠীটিকে অপরাধপ্রবণ বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল) এবং শিক্ষা গ্রহণের অধিকার সে রাখে না। সে আরেকজন লোধা ভদ্রলোককে ভালবাসত। তারা বিয়ে করেছিল কিন্তু একসঙ্গে থাকতে পারত না কারণ তার স্বামীর চাকরির কারণে। একদিন সে বাড়ি ফিরে এসে দেখে স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে। কারণ সে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিপীড়নের শিকার হয়েছিল। এসব বিষয় আদিবাসী গোত্রদের সঙ্গে সব সময়ই হয়ে থাকে। আমরা জানি না এসব ঘটে আসছে। তখন আমি এসব কাহিনি লিখলাম। এটাই আসলে একমাত্র জিনিস, যেটা আমি জানি কীভাবে সেটা করতে হয়। আমি বেশি কিছু করতে পারিনি এবং সেখানে এখনো অনেক কাহিনি আছে, যেগুলো আমি লিখতে চাই।"* [৬]

– এভাবে আমরা যদি তাঁর ছোটোগল্পগুলি বিচার করি তবে দেখা যাবে, প্রত্যেকটি গল্পের এমনই কোন না কোন বাস্তবিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। এই সমস্ত প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে এই পর্বে তাঁর ছোটোগল্পে লালিত রুদ্ধ-কণ্ঠদূর্বল অন্ত্যজ নারী তথা আদিবাসী নারীদের আলোচনায় অগ্রসর হবো।

মহাশ্বেতা দেবীর গল্পগুলির মধ্যে বিশেষত্বের দাবিদার *'বাঁয়েন'* গল্পটি। এই গল্পে 'ডোম' অন্ত্যজ শ্রেণির উল্লেখ রয়েছে। গল্পের মূল থিম আবর্তিত হয়েছে চণ্ডী নামক এক নারী চরিত্রকে কেন্দ্র করে। চণ্ডী'ই এই গল্পে 'বাঁয়েন' নামে পরিচিত। সে জাতিতে ডোম। সামাজিক অবস্থানের দিক থেকে এঁরা তথাকথিত নিম্ন গোত্রীয়। ডোমদের মধ্যে একটি প্রচলিত সংস্কার হল কাউকে বাঁয়েনে ধরলে তাঁকে মারতে নেই। বাঁয়েন মারলে সমাজের পক্ষ্যে অ-মঙ্গলকর। ডাইনি ধরলে পুড়িয়ে মারার রীতি প্রচলিত। কিন্তু বাঁয়েনে ধরলে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। বাঁয়েনের ছায়া মাড়ানো গর্হিত এক কাজ। ভগীরথ তার বাবাকে বাঁয়েনের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছে। সে মনে করে তার বাবার মৃত্য অবধারিত। বাঁয়েনেরও পরিবার পরিজন আছে। বলাবাহুল্য সংস্কারাচ্ছন্ন ভগীরথ হল চণ্ডী তথা বাঁয়েনেরই সন্তান। এই সমাজই তাঁকে বাঁয়েন বানিয়েছে। সমাজে আর পাঁচজনের মতোই সে চলাফেরা করতো। আজ সে বাঁয়েন। সমাজের চোখে বাঁয়েন, স্বামীর চোখে।

বাসুদেব দাস তাঁর 'মহাশ্বেতা দেবী : বাংলা কথা সাহিত্যে নবজীবনের রূপকার' শীর্ষক প্রবন্ধে 'বাঁয়েন' গল্প প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন:

> *"...কুসংস্কারের এক ভয়াবহ স্বরূপ দেখা যায় 'বাঁয়েন' গল্পে। দরিদ্র সাধারণ নারী ছিল মলিন্দরের স্ত্রী, ভগীরথের মা, সে অকস্মাৎ হয়ে গেলে চণ্ডী বাঁয়েন। বাঁয়েন ধরার পর গ্রামের লোক চণ্ডীকে গ্রাম-ছাড়া করে। বাঁয়েনকে একা থাকতে হয়। ...নিজের স্ত্রীকে বাঁয়েন বলে চিহ্নিত করে তাঁকে সমাজ থেকে বের করে দিতে তার বিবেকে বাধে না। গ্রামের লোকের চোখে চণ্ডী মানুষ নয়, বাঁয়েন।"* [৭]

— অথচ এই চণ্ডী নিজের জীবনকে বিসর্জন দিয়ে গ্রামের মানুষ-জনদের বাঁচালো। যে সমাজকে সে আজ বাঁচালো, সেই সমাজই তাঁকে 'বাঁয়েন' বানিয়েছিল। এই সমাজই সব চেয়ে চেয়ে দেখেছিল। সমাজের অসাধ্য বলে কিছু নেয়। অথচ সমাজে ব্রাত্য এই চণ্ডী বাঁয়েনই সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েছে। সমাজ কি না পারে তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন গল্পকার। মৃত্যুর পর সে প্রমাণ করে গেল — "সে-ও রক্ত-মাংসের মানবিক গুণসম্পন্ন স্নেহময়ী জননী, বাঁয়েন নয়।"[৮] চণ্ডীর 'বাঁয়েন' পূর্ববর্তী জীবন অর্থাৎ স্বাভাবিক জীবনে যখন বসবাস করতো, সেই

সময়কালের জীবনানুসন্ধান করলে বেশ কয়েকটি দিক উঠে আসে। চণ্ডীর বাবা ভাগাড়ের কাজ করতো। কারোর মৃত্যু হলে তার জন্য গর্ত খুড়ে দিত এবং কাটাগাছ দিয়ে তা ঢেকে রাখতো। কাঁটা দিলে শেয়াল ঐ লাশের কাছে যাবে না। চণ্ডীর বাবা মারা যাবার পর বংশগত উত্তরাধিকার সূত্রে চণ্ডী সেই কাজের দাবি করে:

> *"একদিন একটা ফরসা মেয়ে, কটা চোখ, লালচে চুল, এসে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল—আমি চণ্ডী, অমুক গঙ্গাপুত্তের বিটি, বাপ মরে গেল। বাপের ডালা এখন মোকে দেন। বাপের কাজ তুই করবি?*
> *— করব।*
> *— তোকে ভয় লাগে না?*
> *— মোর ভয় ডর নাই।"* [৯]

— আবার কখনো কখনো চণ্ডী মনের সঙ্গে বিদ্রোহ ঘোষণা করে পিতৃ আজ্ঞা অগ্রাহ্য করে কাজ ছাড়তে চেয়েছে। স্বামী মলিন্দর তাঁর কথা বেশি আমল দিত না। চণ্ডী জানতো— 'সেই অশুচি শবদেহ, হাড়, চামড়া নিয়েই ওর জীবিকা।' সে বাঁয়েনের কাজ ছাড়তে চাইলেও সমাজ তাঁকে ছাড়বে না। সমাজ তাঁকে কাজ করিয়েই নেবে। চণ্ডীর জীবনের এ এক করুণ পরিণতি। বড়ো ধরনের ট্রাজেডি সংকেত বহন করে তাঁর এই পেশা। এই সমাজ কি না পারে। তাঁর স্বামী ছিল, সন্তান ছিল, সংসার ছিল। কিন্তু আজ সব থেকেও সে পরবাসে। সমাজ তাঁকে গ্রামছাড়া করেছে। চণ্ডী আজ পরবাসী। তাঁর পরিচয় চণ্ডী বা ভগীরথের স্ত্রী নয়। তাঁর পরিচয় সে বাঁয়েন। সমাজ তাঁর কাছ থেকে সব কেড়ে নিয়েছে। উপহার দিয়েছে তিন অক্ষরের নাম — বায়েঁন।

ব্যক্তিচৈতন্যে জাগরণে চণ্ডী এক জীবন্ত উদাহরণ। জীবনে এভাবেও বাঁচা যায়। অন্যায়, অত্যাচার, নিপীড়নের যুক্তিগ্রাহ্য পটভূমি নির্মাণ করেছেন মহাশ্বেতা দেবী। সেই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে কঠোর লড়াই করেই বাঁচতে হবে— এমনই বার্তা দিতে চেয়েছেন গল্পকার। নিপীড়িতজনের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের বোঝার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের সমস্যাকে তাঁদের অনুভবগম্য করে স্বাধিকার বোধের সঞ্চার করতে চেয়েছেন।

বিষয় বিচিত্রতার দিক থেকে '*রুদালী*' গল্পটি অভিনব। রুদালী শব্দটির অর্থগত পরিসর দেখলে এই শব্দের ব্যাখ্যা পরিষ্কার হবে। এরা পেশাজীবি সম্প্রদায়। টাকা দিয়ে ভাড়া করা হয়। কাজ মৃতের বাড়িতে গিয়ে কান্নাকাটি করা। এই নারীরা তথা পেশাজীবি সম্প্রদায় মূলত রাজস্থানের বিভিন্ন অন্ত্যজ গোত্রের। এভাবে টাকা দিয়ে কান্নাকাটির জন্য নারী ভাড়া করার রীতি রাজস্থানেই দেখা যায়। 'রুদালী' শব্দটি বাংলা নয়।
গল্পের নায়িকা শনিচরী। পেশায় রুদালী অর্থাৎ ভাড়াটে কাঁদুনি। টাকার বিনিময়ে কান্নাকাটি করে। মৃতের সংস্কার সংক্রান্ত নানা ধরণের কাজ তাকে করতে হয়। নিজের আত্মীয়-পরিজন মারা গেলে শনিচরীর কান্না করার অবকাশ পায়নি:

> *'শাশুড়ি মরতে শনিচরী কাঁদেনি। ওর বর আর ভাশুর, শাশুড়ির দুই ছেলেকেই হাজতে পুরেছিল মালিক-মহাজন-রামাবতার সিং। বুড়িকে দাহ করার ব্যবস্থা করতে শনিচরী এত ব্যস্ত ছিল যে কাঁদার সময় হয়নি। হয়নি তো হয়নি! বুড়ি যে জ্বালান জ্বালিয়ে গেছে, কাঁদলেও তো শনিচরীর আঁচল ভিজত না।* [১০]

সমাজ মনস্তত্ত্ব সে ভালোভাবেই বোঝে। তাকে কাঁদতে হবে অন্যের বাড়িতে গিয়ে। তাতে টাকা আয় হবে, সংসারে অন্ন সংস্থান হবে। কান্না বিক্রি করেই তাকে বাঁচতে হবে। পেটের জ্বালা বিষম দায়। কিচ্ছু মানেনা। কেউ মরলে তার রোজগারের রাস্তা খোলে। বাঁচার রসদ পায়।

শনিচরীর ব্যস্তময় জীবনে বুধুয়ার বাপের জন্য তাঁর কাঁদা সম্ভব হয়নি। অবশেষে সে কাঁদলো। এ কান্না স্বজন হারানোর কান্না নয়, কিংবা দুঃখের কান্না নয়। এ কান্না রুজি রোজগারের কান্না। মৃত স্বামীর জন্য কান্না নয়, কাঁদতে

হয় দু'মুঠো ভাতের জন্য। জীবনের এ এক চরম পরিস্থিতি। কেবল কাঁদলেই টাকা পাওয়া যাবে না। কান্নারও রকমফের আছে। বুক ঠুকে বা চাপড়ে কান্না, কেঁদে লুটিয়ে পড়া, কেঁদে মাথা ঠোকা, শ্মশানে গিয়ে কান্না ইত্যাদি — সব ধরনের কান্নার জন্য মজুরি ধার্য আছে ভিন্ন ভিন্ন। ট্রাজেডির চরম মাত্রা স্পর্শ করে কান্নার রকমফের অনুযায়ী মজুরী নির্ধারণে।[১১]

নারীরা সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সর্ব বিষয়ে ক্ষমতানুযায়ী যথাযোগ্য সুযোগ পাবে এবং তাদের ক্ষমতানুযায়ী নিজেদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করবে বা নেতৃত্ব দেবে — এই ছিল মহাশ্বেতা দেবীর আকাঙ্ক্ষা। বিভিন্ন গল্পের নারী চরিত্রের মধ্যে আমরা সেই চেতনাবোধ লক্ষ্য করি। বীর্যে, বুদ্ধিতে, সাহসে, প্রতিবাদ-প্রতিরোধে, প্রেমানুভূতি ও প্রেমাকাঙ্ক্ষায় নারী চরিত্ররা স্বাতন্ত্র্যের ছাপ রেখেছেন। এই প্রসঙ্গে আমরা *'শিকার'* নামক গল্পের কথা উল্লেখ করতে পারি। নারীদের প্রতি সমাজের অমানবিক আচরণের তীব্র প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত হয়েছে এই গল্পে। সমাজে নারীদের প্রতি পুরুষের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পায়।

গল্পের প্রধান চরিত্র মেরী নামধারী এক নারী। বাংলা সাহিত্যে সৃষ্ট অন্ত্যজ নারী চরিত্রের মধ্যে এই মেরীকে সামনের সারিতেই রাখা যায়। সে নারীর স্বাজাত্যবোধ, কর্মদক্ষতা, প্রেমাকাঙ্ক্ষায় সজীব। উচ্চবিত্ত সমাজের সম্ভোগলিপ্সু পুরুষরা প্রান্তীয় সমাজের নারীদের শারীরিক চাহিদা মেটাবার জন্য বেশিরভাগ সময় ব্যবহার করেন। মেরীর ওপরেও এমন কুদৃষ্টি পড়েছিল। তসিলদার তাকে পেতে চেয়েছিল। এমনই এক পরিস্থিতিতে আমরা মেরিকে প্রতিস্পর্ধী রূপে আবিষ্কার করি:

> *"তসিলদার তাঁবুতে বসে মেয়ে মরদকে পয়সা দিচ্ছিল। প্রচুর মানুষের ভিড়। তারই মধ্যে মেরী ঢুকে পড়ে ও জঘন্য গাল দিয়ে কাপড়টা ছুঁড়ে দেয়। বলে, শহরের রাণ্ডী পেয়েছিস আমাকে। কাপোড় দিয়ে ভোলাতে এসেছিস ? ফের বদমাশি করবি তো নাক কেটে নেব। হাত দুলিয়ে ও বেরিয়ে যায় ও সগর্বে।"* [১২]

– টাকা পয়সা দিয়ে ছলে কৌশলে নারীদের কিনতে চেয়েছিল। সেই অভিসন্ধি সে ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে। বিভিন্ন সময় বিভিন্নজন তাঁর কাছে নানারকম অবৈধ আবদার নিয়ে হাজির হয়েছে। প্রণয়ী হতে চেয়েছে। কিন্তু 'মেরী দা তুলে দেখিয়েছে।' এই প্রসঙ্গে মেরীর যা বক্তব্য তা সত্যিই রোমহর্ষক:

> *"তারা বাইরের মানুষ। ভিক্‌নির মতো, তাকেও পেটে বাচ্চা দিয়ে ওরা পালাবে না, কে কথা দিতে পারে।"* [১৩]

– তার এই বক্ত্যবের মধ্যে যুগসচেতন নারী চেতনার প্রকাশ পায়। মেরী যে কতটা আত্মসচেতন ও বাস্তব পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তা তাঁর বক্তব্যতেই পরিষ্কার।

তোহ্‌রি বাজারে মেরীর ভক্তবৃন্দের অভাব নেই। সে ষ্টেশনে নামে রানীর মতো। বাজারে তাঁর জায়গাও পাকাপোক্ত। পুরুষদের কাছ থেকে বিড়ি চেয়ে খায়। বাজারিয়াদের পয়সায় চা পান খায়, কিন্তু কাউকে আমল দেয়না। অনেক নেতা মস্তান ও তাদের সন্তান তাঁর প্রণয়ী। গল্পাকার অসাধারণ বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর সম্পর্কে:

> *"মেরী ওরাও যখন এসে দাঁড়ায়, তখন সে যেমন ট্রেনটিকে দেখে, যাত্রীরাও চোখ পড়লে তাকে দেখে। বয়স আঠারো, দীর্ঘাঙ্গী, চ্যাপ্টা মুখ-নাক, রঙ তামাটে ফরসা। সাধারণত ও ছাপা শাড়ি পরে। দূর থেকে ওকে খুব মোহনীয় দেখায় কিন্তু কাছে গেলে বোঝা যায়, ওর চোখের ভাষায় খুব কঠিন প্রত্যাখ্যান আছে।"* [১৪]

— আমরা গল্পের শেষে এসে মেরীর নারীত্বের স্বরূপটি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারি। তসিলদার মেরীকে ভোগ করতে চেয়েছিল। সুযোগ বুঝে সে একদিন মেরীকে কব্জাও করে নিয়েছিল। মেরীও তা অনুভব করতে পেরেছে।

সেদিন বুদ্ধিবৃত্তির যথার্থ প্রয়োগ করে তসিলদারের হাত থেকে সে নিস্কৃতি পায়। মেরী তসিলদারের কাছে হোলির দিন নিজেকে সঁপে দেবে এই অঙ্গীকারে নিস্কৃতি পায়। হোলির দিন দু'জন দু'জনকে শিকার করার আশায় প্রহর গুনছিল। তসিলদার যুবতীকে দেহ-মনে শিকার করতে চেয়েছিল, আর মেরী 'বড়ো শিকার' কে প্রাণে মেরে স্বস্তি পেতে চেয়েছিল। শেষ হাসি হেসেছে মেরী। তসিলদার চিরতরে বিদায় নিয়েছে। মেরী হয়ে উঠেছে স্বজাতি জাগরণে নারীশক্তির স্ফুলিঙ্গ।

মেরীর মুসলমান যুবককে ভালোবাসার মধ্যেও প্রতিবাদী প্রেমাকাঙ্ক্ষার পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। আজকাল হিন্দু-মুসলিম পরিবারে অহরহ বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে দেখা যায়। আজ একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এটা অসম্ভব কিছু না। কিন্তু আদিবাসী সমাজে সত্যিই এই ঘটনা প্রতিস্পর্ধী। আমরা জানি জনজাতিদের মধ্যে প্রবলভাবে স্বধর্মগত ভাবানূভূতি কাজ করে। তার পরে যুবতী হয়ে মুসলিম যুবককে নিয়ে ঘর করার স্বপ্ন দেখা বাংলা সাহিত্যে খুব বিরল ঘটনা। সামাজিক বাধা-নিষেধ অমান্য করে জালিমকে নিয়ে ঘর বাঁধার আকাঙ্ক্ষা সত্যিই আশ্চর্যজনক। এই ঘটনা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিজনক ঘটনার দ্যোতক। নারীবাদী ভাবনার মূল নির্যাস যদি ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ, ব্যক্তিস্বাধীনতার মধ্যে খুঁজি, তাহলে বলতে হয় তা মেরী চরিত্রের মধ্যে অনেকটায় প্রোথিত আছে।

মহাশ্বেতা দেবীর ছোটোগল্পে এভাবে যদি আমরা অন্ত্যজ কণ্ঠস্বরকে খুঁজি, তাহলে দেখবো বহুল চরিত্রের আনাগোনা। যেমন— 'ধৌলী' গল্পের বিষয়বস্তু আবর্তিত সহজ সরল এক আদিবাসী মেয়েকে কেন্দ্র করে। সে জানে তাঁর শরীরই তার শত্রু। বর মারা গেলে ধৌলীর দিকে নজর পড়ে তার ভাসুরের। পালিয়ে আসে মায়ের কাছে। ধরা পড়ে ব্রাহ্মণ সন্তান মিশ্রিলালের প্রেমে। মিশ্রিলালও ধৌলীর পেটে তার উত্তরাধিকার রেখে পালিয়ে যায়। ধৌলী পতিতাবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হয়। আদিবাসীদের নির্যাতন, ধর্ষণ ইতিহাস সিদ্ধ ঘটনা। বেশিরভাগ সময় এই অনাচার সাধন করে থাকে উচ্চবিত্ত সমাজের তথাকথিত ভদ্রলোকেরা। সব দায়, দোষ গিয়ে পড়ে নির্যাতিতার ওপর। এই ধরনের নিম্নবৃত্তীয় নারীরা পতিতাবৃত্তির পথ কেনো অবলম্বন করলো, কি তার প্রেক্ষিত তা বিবেচনা করার শুভবুদ্ধিসম্পন্ন লোক থাকে না। নিষ্কৃতি পায় উচ্চকোটির প্রতিনিধি। কারণ সামাজিক বিন্যাসটা এমনভাবে সাজানো থাকে, যেখানে নির্যাতিত সদস্যগণই বারংবার নির্যাতনের শিকার হয়। সমাজের এ এক চরম লীলাখেলা। অন্যায়কারী এবং বিচারকারী অবস্থান করে একই বিন্যাসে। এদের বন্ধন (Bonding) সজ্জা গড়ে ওঠে সুবিধাবাদী ও সুযোগ সন্ধানী হবার কারণে। এই বন্ধন-সজ্জা এতটাই মজবুত যে সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য করতে বেশিক্ষণ সময় নেয়না। তাদের উদ্দেশ্যই হল অন্ত্যজ কণ্ঠস্বরকে গলা টিপে হত্যা করা। 'ধৌলী' গল্পে এমনই বাস্তবোচিত অভিজ্ঞতার নির্যাস পায়।

নকশাল আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত 'দ্রৌপদী' গল্পটি। এর কাহিনি আখ্যান বিদ্ধৃত হয়েছে আদিবাসীদের জীবনের নানা বঞ্চনা ও সংস্কার এবং গৌরবময় দিক নিয়ে। *আইভি রহমানকে* দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মহাশ্বেতা দেবী 'দ্রৌপদী' গল্প প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন:

> *"দ্রৌপদী' গল্প বিশেষ একটা আন্দোলনের কথা নিয়ে লিখেছি। ৭০এর দশকে বিশেষ একটা জায়গায় আদীবাসীদের অবস্থা খুব খারাপ ছিল। তাদের জায়গা জমি সব চলে যাচ্ছিল, সমস্ত জিনিসটাই একটা প্রতিবাদ মূলক পটভূমি তৈরি করেছিল, দ্রৌপদী যখন উলঙ্গ হয়ে বেরিয়ে আসে তখন কিন্তু চরম একটা চপেটাঘাত সমাজের মুখেই পড়ে তাই না? গল্পের শেষে সেনানায়ক কিন্তু একেবারেই পরাজিত।*
>
> *তারা শুধু একটা মেয়েকে উলঙ্গ করতে পারে- লালসা চরিতার্থ করতে পারে কিন্তু সম্মান দিতে পারেনা। কিন্তু দেখো এই ঘটনার পর সমাজের মানুষ কিন্তু দ্রৌপদীকেই সম্মান করে তাইনা? এই সম্মান দ্রৌপদী আদায় করে নিয়েছে। আমি চাই সমাজের দ্রৌপদীরা সবাই এই ভাবেই*

*জেগে উঠুক। কেড়ে নিক তাদের প্রাপ্য। পরাজিত হয়ে যাক ওই সব সেনানায়ক সব সমাজেই।"* [১৫]

— নারীর চিরন্তন দুর্বলতা ও শক্তির আধার হল তার নারীত্ব। গল্পকার এই নারীত্বকে উপস্থাপন করেছেন ভিন্নভাবে। নারীর নগ্নতাকে তার শক্তির আধার হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। আদিবাসী নারীচরিত্র দ্রৌপদী সমগ্র বাংলা সাহিত্যের এক অনবদ্য সৃষ্টি।

এভাবে আমরা তাঁর বিভিন্ন গল্পের পাঠবিশ্লেষণ করলে অন্ত্যজ ও আদিবাসী নারী চরিত্রের উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষ্য করতে পারি এবং তাঁর দৃষ্টান্ত ও সংখ্যা যৎসামান্য নয়। স্বল্প পরিসরে নির্বাচিত কয়েকটি গল্পের নিরিখে অন্ত্যজ ও আদিবাসী নারীদের বিভিন্ন প্রেক্ষিতকে তুলেধরার এটি সামান্য প্রচেষ্টা মাত্র, এ নিয়ে অধ্যয়নের বিস্তৃত সুযোগ রয়েছে।

**৬. শেষের কথা:** প্রান্তজনের স্বপ্নের বুননকে অনন্য মাত্রা দিয়েছেন মহাশ্বেতা দেবী। তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, সাধন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকরা নিম্নবৃত্তের জীবন ধারাকে লোকান্তর থেকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেছেন ঠিক। তবে অন্ত্যজ কণ্ঠস্বর প্রতিফলনের এটা একটা পর্যায় ছিল। মহাশ্বেতা দেবী জনসমাজের গভীরে প্রবেশ করে, তাঁদের দৈনন্দিন জীবনাচারকে অনুপঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষে দর্শক-সমাজে তুলে ধরেন। সাহিত্য সৃষ্টির সূত্রে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সাংবাদিকতা এবং লেখক হবার সুবাদে আমরা মহশ্বেতা দেবীকে বহুবিধভাবে সমাজের হিতকর কাজে পাই। একাধারে সাংবাদিক, লেখক, সমাজকর্মী - বহুধাবিস্তৃত তাঁর কর্মধারা, যা আপাতভাবে বাংলা সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতিকে উর্বর করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সহ বিভিন্ন প্রদেশের উপজাতি এবং নারীসমাজ নিয়ে কাজ করার দৌলতে মহাশ্বেতা দেবী অতিপরিচিত এক নাম। লেখনীই ছিল তাঁর অস্ত্র। বিভিন্ন সাহিত্য, পত্র-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে তিনি লিখে গেছেন। উপজাতি এবং নারীদের ওপর শোষণ এবং বঞ্চনার ইতিবৃত্ত তুলে ধরেছেন। প্রান্তজনের স্বপ্ন-গাথাকে সাহিত্যরূপ দিয়ে জনসাধারণের গোচরে আনার জন্য আজ তিনি 'প্রান্তজনের সখা' হিসাবে পরিচিত। অশোক দাশগুপ্ত মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্য প্রতিভা তথা তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির মৌলিকতা বা নিজস্বতার কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন:

*"রূপকথার জগৎ নির্মাণ করতে গিয়ে তিনি নতুন একটা স্বর, নতুন একটা ভাষাই তৈরি করে নিতে পেরেছিলেন। আর আশ্চর্য, সেই স্বর নাগরিক সমাজের সাহিত্যবোদ্ধা ও পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্যও হয়ে উঠল। সেই ভাষাকে মাটির ভাষা বলে গ্রহণ করতে কেউ দ্বিধা করল না। এককথায় বলা যায় মহাশ্বেতাদি ভারতীয় সাহিত্যে এক নতুন ভুবন তৈরি করলেন, যে ভুবনের কথা সেভাবে তাঁর আগে বাংলা সাহিত্যে আসেনি।"* [১৬]

- আমরা পরবর্তীতে দেখেছি তাঁর বেশিরভাগ লেখা ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাসহ পৃথিবীর নানাদেশে অনুদিত হয়েছে। শিল্প সৃষ্টির কোন মাত্রা অতিক্রম করলে কোনো সাহিত্য বিশ্ববাজারে পদচারণা করতে পারে তা আমরা স্পষ্টতই অনুভব করতে পারি। সত্যিই তিনি বাংলা সাহিত্যের খোল-নলচে পালটে দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্য ও সমাজে 'প্রান্তজনের সখা' হিসাবে আজীবন মর্যাদা পাবেন মহাশ্বেতা দেবী। 'আরম্ভ সীমান্তহীন মাসিক' পত্রিকায় মহাশ্বেতা দেবীর প্রয়াণে যে শ্রদ্ধার্ঘ্যবার্তা তা বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য:

*"প্রান্তবাসীদের জীবন, যাপন ও চলমানতাকে তিনি এনেছিলেন বাংলা সাহিত্যের মূলধারায়। সুখে-দুঃখে, বঞ্চনা-প্রতিরোধে তাদের পাশে দাঁড়ানো ছিল তাঁর স্ববিবেচিত দায় ও কর্তব্য। তাঁর দীপ্র স্বর বারবার তুচ্ছ করেছে প্রাতিষ্ঠানিক দম্ভ ও বৈরিতা, জনচৈতন্য সঞ্চারিত করেছে স্পর্ধা ও প্রত্যয়। আপসহীন, মুক্ত চিন্তক মহাশ্বেতা দেবীর প্রয়াণে আরম্ভ-র শ্রদ্ধার্ঘ্য।"* [১৭]

— সুখে-দুঃখে, বঞ্চনা-প্রতিরোধে জনসমাজের পাশে দাঁড়ানো এবং তাঁদের জন্য কিছু করা তাঁর নৈতিক দায়িত্ব বলে তিনি মনে করতেন। এহেন একজন মানুষকে কেবল সাহিত্যিক হিসাবে বিবেচনা না করে, তাঁকে সামগ্রিকতার ভিত্তিতে বিবেচনা করাই বরং ভালো। আর তাঁর সাহিত্যকে কেবল সাহিত্য হিসাবে না দেখে, একটা প্রতিবাদী লড়াইয়ের ধারাভাষ্য হিসাবে, সাহিত্য-সমাজ-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে ঐতিহাসিক দৃষ্টি দিয়ে দেখলে যথার্থ্য মর্যাদা দেওয়া হবে। তিনি নিজের লেখা সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন:

> *"আমার লেখালেখির ব্যাপার নিয়ে বলতে গেলে, সত্তরের দশক ছিল আমার কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সে সময় আমার কাজকর্ম নিয়ে 'ফ্রন্টিয়ার' পত্রিকায় কিছু লিখেছিলাম। আমার কাছে চিরকালই লেখাই অ্যাকশান।"* [১৮]

মহাশ্বেতা দেবীর একাধিক গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক। তাঁর মতে — মহাশ্বেতা দেবী বিশ্ববিখ্যাত লেখকদের সঙ্গে তুলনায় চলে আসেন। তাঁর গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ তথা আদিবাসীদের অজানা ইতিহাস সারা পৃথিবীর সাহিত্যে সম্মানিত। তাঁর গল্পগুলি মূল্যায়ন করলে দেখা যায়:

ক. মহাশ্বেতা দেবী অন্ত্যজ চরিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে অদ্বিতীয়। মাটির সান্নিধ্যে থাকা মানবীয় চরিত্র সৃজনেই তাঁর আনুগত্য লক্ষ্য করা যায়। এ কারণেই বেশিরভাগ প্রধান ও সাহিত্য-সফল চরিত্রগুলো আদিবাসী শ্রেণি থেকে উদ্ভুত। উদাহরণ হিসাবে চণ্ডী, মেরী, ধৌলী প্রমুখ চরিত্রের কথা উল্লেখ করা যায়।

খ. মহাশ্বেতা দেবী সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়, সমস্যাকে সামনে রেখে সমাজের গভীরে প্রবেশ করেছেন। সামাজিক নানা বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন। যার প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায় ছোটোগল্পগুলিতে। একারণেই বাংলা সাহিত্যে মহাশ্বেতা দেবীকে অনেকেই সমাজতাত্ত্বিক হিসাবে চিহ্নিত করে থাকেন। আমাদের বক্তব্য তাঁকে কেবল সমাজতাত্ত্বিক না বলে, সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক হিসাবে চিহ্নিত করায় অধিক সমুচিত। কেননা তাঁর মতো করে অন্ত্যজ সমাজের কণ্ঠস্বর খুব কম জনই অনুভব করতে পেরেছে। মহাশ্বেতা দেবী, তাঁর ছোটোগল্প তথা সাহিত্যে নিজের মতো করে নিঃস্বজনের চর্চা করে গেছেন।

গ. মহাশ্বেতা দেবী কেবল একজন সমাজতাত্ত্বিক বা সাহিত্যিক হিসাবে নন, বরং একটা প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচিতি পাবেন বাংলা সাহিত্য তথা সমাজে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্য-বিষয় প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন: "তিনি বহু বিষয় লিখেছেন। কিন্তু বিশেষ করে ইদানীং কালে আদিবাসী ও জনজাতি যারা সমাজে অবহেলিত বটেই, সাহিত্যেও উপেক্ষিত তিনি তাঁদের তুলে ধরেছেন। .... আমি তাঁর সাহিত্যকর্ম এবং ব্যক্তিত্বের বিশেষ অনুরাগী।" [১৯] - এই অনুরাগ ধর্মীতার পশ্চাতে যেমন রয়েছে সাহিত্যকর্ম এবং ব্যক্তিত্ব, ঠিক তেমনি রয়েছে মহাশ্বেতার অনুচরবর্গ নিয়ে সংগঠিত বিশেষ এক প্রতিবেশ। যে সংগঠিত প্রতিবেশ বিশাল এক প্রতিষ্ঠানের রূপ ধারণ করে, যা সমসময় এবং উত্তর প্রজন্মের সমাজসেবী এবং সাহিত্যিকদের কাছে অনুনকরনীয় হিসাবে দেখা দেয়। বাংলা সমাজ ও সাহিত্য রচনায় তার প্রভাব দেখা দিল।

ঘ. বাংলা সাহিত্যে সাব-অলটার্নচর্চার তিনিই প্রথম করেছেন এমন কিন্তু নয়। তবে বাংলা সাহিত্যে সাব-অলটার্ন ধারা আরোও তীব্র রশ্মিচ্ছটায় আলোক উজ্জ্বল হয়ে উঠল তাঁর রচনায়। সেই ভাবধারা বাংলা সাহিত্যে ব্যপকভাবে প্রভাব ফেললো। যার ফলে পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন লেখক এই অনালোকিত অঞ্চলকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে ভিন্ন সুরের সাহিত্য ধারার প্রকাশ করলো, যা বাংলা সাহিত্যের প্রথানিষ্ঠ একটা গড়নের পতন ঘটিয়ে নব ভাবনার সঞ্চার করলো। যার কাণ্ডারী হিসাবে আমরা এই মহাশ্বেতা দেবীকে চিহ্নিত করতে পারি।

ঙ. সমাজসেবী হিসাবে তিনি বাস্তবে যা দেখেছেন তা সাহিত্য-শিল্প হিসাবে প্রকাশ পেয়েছে। আবার তিনি সমাজের যে সমস্যাগুলি উপলব্ধি করেছেন, সেগুলির সমাধান করতে চেয়েছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে তা সমাধানও করেছেন। একারণে সাহিত্যিক সত্ত্বা এবং সমাজসেবী সত্ত্বার যথার্থ সংবন্ধন ঘটেছে মহাশ্বেতা দেবীর জীবনে। তাঁর সৃজনী শিল্পের একটা প্রায়োগিক দিক রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে তা উদ্দেশ্যমুখীন। তবে সাহিত্যরস বিবর্জিত নয়। সাহিত্য-গুণ কখনো ক্ষুন্ন হয়নি। একদিকে সাহিত্য শিল্প, অন্যদিকে সমাজ-সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে তাঁর সৃজনী শিল্পের একটা প্রায়োগিক দিকের প্রকাশ - মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যে ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। সেদিক থেকে বিচার করলে বাংলা সমাজ ও সাহিত্যের বাড়তি পাওনা মহাশ্বেতা দেবী এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি অদ্বিতীয় সমাজসেবী সাহিত্যিক।

সামগ্রিক আলোচনার বিচারে আমরা বলতে পারি — তাঁর রচিত গল্পগুলিতে তিনি উচ্চ ক্ষমতাশীল শক্তির বিরুদ্ধে, নিঃস্বজনের হয়ে কলম ধরেছেন, অন্ত্যজ প্রতিবাদী চরিত্র সৃজন করেছেন। দেশীয় সামন্ততান্ত্রিক তথা প্রভুত্বশালী সমাজ ব্যবস্থার শোষণের প্রতিকায়িত রূপ হিসাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শোষিত কণ্ঠস্বরকে প্রকাশ করেছেন। তাঁর লেখা হয়ে উঠেছে অন্ত্যজ শ্রেণির ঐতিহাসিক দলিল। সাহিত্যচর্চার সমান্তরালে তিনি রচনা করেছেন জনবৃত্ত অন্বেষণের বিকল্প ইতিহাস। এহেন একজন উচ্চমার্গের সাহিত্যিক তথা সমাজ দরদি মানুষকে আমরা গত বছরেই (২০১৬) হারিয়েছি।

**উৎসসূত্র :**

১. মণ্ডল, উৎপল, কামনা মজুমদার, *মহাশ্বেতার গল্প : মহাশ্বেতার সন্ধানে,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ১০, মুদ্রিত।
২. চৌধুরী, কুশল (সম্পাদক), '*জাগ্রত বিবেক* ', ২০১৬ সেপ্টেম্বর, পৃ. ১৬, মুদ্রিত।
৩. বর্তিকা, 'শবরতীর্থ', *'খেড়িয়া-শবরদের জীবন কর্ম ও সমাজ'*, পুরুলিয়া, জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৯৬, পৃ. ৪৫, মুদ্রিত।
৪. ধর, তপন (সম্পাদক), *প্রসাদ,* ৫০ বর্ষ, ২০১৬ সেপ্টেম্বর, পৃ. ১১, মুদ্রিত।
৫. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র ৪, পৃ. ১০।
৬. চক্রবর্তী, মধুরিমা, '*লেখক সামাজিক দায়বদ্ধতা এড়াতে পারেন না- মহাশ্বেতা দেবী',* সাম্প্রতিক দেশকাল, বর্ষ ৩, সংখ্যা ১৭, বৃহস্পতিবার, ঢাকা, ৪ আগস্ট ২০১৬, ই-মাধ্যম। (মহাশ্বেতা দেবীর জীবদ্দশায় ২০১৩ সালে এই সাক্ষাৎকারটি মধুরিমা চক্রবর্তী নিয়েছিলেন। ইংরেজি থেকে এটি অনুবাদ করেছেন রাফসান গালিব।)
৭. বাসুদেব দাস, *'মহাশ্বেতা দেবী : বাংলা কথা সাহিত্যে নবজীবনের রূপকার'*, আজকাল পত্রিকা, কোলকাতা, ১৮ জুলাই ১৯৯৮, মুদ্রিত।
৮. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র ৭।
৯. গুপ্ত, অজয় (সম্পা.), *মহাশ্বেতা দেবী গল্পসমগ্র - তৃতীয় খণ্ড,* দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৪৫, মুদ্রিত।
১০. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র ৯, পৃ. ২৯৮।
১১. সেলিনা, হোসেন, *রুদালীদের বর্ণরেখা মহাশ্বেতা দেবী,* কালের কণ্ঠ, ঢাকা, ৪ আগস্ট ২০১৬, ই-মাধ্যম।
১২. গুপ্ত, অজয় (সম্পা.), মহাশ্বেতা দেবী গল্পসমগ্র - তৃতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ২৩২, মুদ্রিত।

১৩. গুপ্ত, অজয় (সম্পা.), মহাশ্বেতা দেবী গল্পসমগ্র – তৃতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা , ২০১৪, পৃ. ২২৬, মুদ্রিত।
১৪. গুপ্ত, অজয় (সম্পা.), মহাশ্বেতা দেবী গল্পসমগ্র – তৃতীয় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা , ২০১৪, পৃ. ২২৫, মুদ্রিত।
১৫. রহমান, আইভি, *মহাশ্বেতা দেবী'র সাথে এক সন্ধ্যা,* এই দেশ পত্রিকা, ঢাকা, ৫ ফেব্রুয়ারি (বুধবার) ২০১৪, মুদ্রিত।
১৬. বাহারউদ্দীন (সম্পা.), আরম্ভ সীমান্তহীন মাসিক, বর্ষ ৮, সংখ্যা ৫, আগস্ট ২০১৬, পৃ. ৩৫, মুদ্রিত।
১৭. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র ১৬, পৃ. ৩০।
১৮. কালের কষ্টিপাথর, সেপ্টেম্বর ২০১৪, পৃ. ১৫, মুদ্রিত।
১৯. পূর্বোক্ত তথ্যসূত্র ৪, পৃ. ১০।